প্রেক্ষিত নারীমুক্তি-মানবমুক্তি

হাসনে আরা বেগম

ছিল নর-নারী। নর মানুষ হয়ে গেল! নারী নারীই রইল। প্রায় সব ভাষাই সেই সাক্ষ্য দেয়। ইংরেজি Man বা Manly পুরুষকেই বোঝায়। নারীর জন্যে Woman। এই হয়ে ওঠা হাজার হাজার বছরের সংস্কৃতিনির্ভর। নারীকে মানুষ না করে নারী করে রাখার জন্যে সমাজ বা পুরুষের নানান রকমের ফন্দিফিকির-টোটেম-টাবু-ধর্মের কবচ। সে এক দ্বান্দ্বিক ইতিহাস। সে ইতিহাস আজকের নারী বহন করছে। জন্মগতভাবেই মানুষ হয়েও নারীকে মানুষ হওয়ার জন্য লড়াই করতে হচ্ছে।

হাজার রকমের বাধা-সংস্কার-কুসংস্কার থেকে মুক্তির জন্যে লড়াই। প্রাপ্য সম্মান তাও আদায় করে নিতে হবে। নানান ছক। প্রথমত, নারীকে দুর্বল করে দেয়া হয়েছে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দিয়ে। সারা পৃথিবীর চেহারাটাই এক। পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তির এক ভাগও নেই নারীর হাতে। দ্বিতীয়ত, নারীর ওপর চালিয়ে দেয়া হয় ধর্মের অসম বিধান। এখানেও পৃথিবীর সব ধর্মই এক কথা বলে। নারীর পবিত্র দায়িত্ব পুরুষের 'সেবাদাসী' হওয়া। নারীকে সৃষ্টিই করা হয়েছে পুরুষের হাড় দিয়ে। তাই নারী পুরুষের ভোগ্যা। মাননীয় মহামানবগণ— তা মনু-মহম্মদ-হিটলার-যিশু-বৌদ্ধ-চৈতন্য যেই হোক না কেন নারী তাদের কাছে পূর্ণ মর্যাদা পায় না।

এমনকি সুফি-দরবেশ-বৈষ্ণবদের কাছেও নারী 'সেবাদাসী' হয়েই রইল।

ধর্মীয় সীমাবদ্ধতার বাইরে রয়েছে বিশাল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। সেখানেও তথৈবচ। পৃথিবীর মহাকাব্যসমূহ কী বলে? সেখানে নারীকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়। নারী কেবল হাত বদল হয়। পিতা থেকে স্বামী স্বামী থেকে পুত্র। রাজার সম্পত্তি থেকে দৈত্যের সম্পত্তি। অবশেষে রাজপুত্র গিয়ে নারীকে উদ্ধার করে। নিজেকে রক্ষা করতে হলে নারীকে হাজার রাত ধরে গল্প বলে যেতে হয়। নারীকে হতে হবে রূপবতী। মেধাবী নয়। মেধা দেখালে বরাহ এসে খনার জিহ্বা কেটে নেয়!

আর মনসামঙ্গলে তো মনসার জন্মই ছিল ভুল। ভুল জন্মের পরিণতিতে পিতা শিবকন্যাকে ধর্ষণ করার উদ্যোগ নেয়। বেহুলাকে উলঙ্গ হয়ে নাচ দেখাতে হয় দেবতাদের দ্বারে দ্বারে। পুণ্যের জন্যে নারীকে যেতে হয় সহমরণে। জাগতিক সমস্ত কিছুর দায়মোচন করতে হয় নারীকে। আর পরকালে বেহেশতে পুরুষের জন্যে অপেক্ষা করে সত্তরটা হুর।

মধ্যযুগের ইউরোপেও নারী মেধাবী হলে ডাইনি বলে পোড়ানো হতো। শেক্সপীয়ারের যুগের গল্প-নাট্যেও ছিল ডাইনির ছড়াছড়ি। রেনেসাঁসের চিত্রকলায় দেখা যায় নারীর ঊর্ধ্বাঙ্গের খোলা অংশ। আর পুরুষের

বেশ দার্শনিক অবয়ব। হাজার বছরের কাব্যকলায় কেবল নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিপুণ বর্ণনার আখ্যান। সে রাধা থেকে বিনোদিনী বা শকুন্তলা থেকে পদ্মাবতী একই চিত্র। রূপমুগ্ধ পুরুষ কেবল ভোক্তা হয়ে থাকতে চায়। দু'-একটা ব্যতিক্রম ছাড়া সাহিত্য সমাজেরই দর্পণ।

অভাবগ্রস্ত না হয়েও অমর্যাদা-অপমান টের পাওয়া যায়; যেমন টের পেয়েছিল ইবসেনের নোরা। অভাবের সময় শেষ হয়ে গেল। স্বামীর চাকরি জুটল। ধার শোধ হলো। সন্তানেরা ছিল দুধেভাতে। তবু এক রাতে নিজেকে আবিষ্কার করে পুতুলের সংসারে। কোনো উচ্চবাচ্য নয়। শান্ত-ধীর-স্থির। পুতুলের সংসার ফেলে বেরিয়ে আসে। কোথায় যাবে সে। খোলা আকাশের নিচে নিশ্চয়ই ঠিকানা নয়। তারপরও নোরা বেরিয়ে এসেছিল গভীর রাতে। আমাদের কানে লেগে আছে নোরার দরজা খোলার শব্দ। তারপর নোরা হাঁটছে একশ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে। পুতুলের গৃহ ত্যাগ করে পেল কি নতুন গৃহের সন্ধান!

নারীমুক্তি বা নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি আমাদের শিল্প-সংস্কৃতিতে দুর্লভ। সমাজে নাই তাই সাহিত্যে অলক্ষিত। বরং নারীরা সংগ্রাম করে যতটুকু এগিয়ে যায়, আকাশ-সংস্কৃতি সেই অগ্রগতি ম্লান করে দেয়। সিনেমা-বিজ্ঞাপন-বিলবোর্ড-এ নারীকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয় তা নারীর জন্য পশ্চাৎপদই নয় কেবল, অপমানজনকও বটে। অথচ সচেতন ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন যে, উল্লিখিত এইসব কর্মযজ্ঞের সঙ্গে তথাকথিত মেধাবী প্রতিভাবান ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের সমর্থন রয়েছে।

মিডিয়াতে নারীকে উপস্থাপন করা হয় লোভনীয় ভোগ্যপণ্য হিসেবে। নারীর শরীরের প্রদর্শনী এখানে মুখ্য বিষয়। প্রতিবাদ-বিপ্লবের নামে যে দৃশ্য তৈরি করা হয়, সেখানে থাকে নারীর যৌন-নির্যাতনের চিত্র। যা জাগরণের বদলে ফ্যান্টাসির জগৎ তৈরি করে। এই স্রোতের বিপরীতে সচেতন নারীসমাজ নারীমুক্তির জন্যে লড়াই করে যাচ্ছে। নারীর দৃশ্যমান উপস্থিতি ফসলের মাঠ থেকে খেলার মাঠ, গৃহস্থালি থেকে কর্মপ্রতিষ্ঠান, সেনাবাহিনী থেকে আকাশ উড্ডয়ন, ইত্যাদি পর্যন্ত। তবু হাজার বছরের অন্ধকার মুছে যায় নি। তথাকথিত ভদ্রসমাজ সরাসরি যৌতুক নেয় না। বৈবাহিক সম্পর্কের সময় পৈত্রিক অর্থনৈতিক অবস্থানের খোঁজ-খবর নেয়। শুধু মানুষের যোগ্যতা বিবেচনা পায় না। পত্রিকার 'পাত্র-পাত্রী চাই'র বিজ্ঞাপন থেকেই সমাজের আকাঙ্ক্ষা জানা যায়। নারীর যোগ্যতা শিক্ষায় নয়— গায়ের রং, উচ্চতা, বয়স তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নারীকে হতে হবে পুরুষের সম্ভোগ-পাত্রী। ভোগের সমতায় পুরুষ এখনো সামন্ত দৃষ্টিভঙ্গি বহন করে।

শহরের দু'-চারজন উচ্চশিক্ষিত কর্মজীবী নারী শিক্ষক-ডাক্তার-উকিল বা রাষ্ট্র পরিচালকরা ব্যতিক্রম। সমাজের ৫ শতাংশ নারীও এর মধ্যে নেই। আবার এই ৫ শতাংশের মধ্যেও স্বামী বা পিতার নামের লেজ নিয়ে অভিজাত হতে দেখা যায়। নারী হয়েও পুরুষের অ্যাজেন্ডাই বাস্তবায়ন করে এরা; এবং আজও তাই পুরুষের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, যৌন-নিগ্রহ, খুন-ধর্ষণ ইত্যাদি চলছেই। মনস্তাত্ত্বিকভাবে পুরুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য এসব করে যাচ্ছে। নারী সিদ্ধান্ত নিতে পারে পরিবার ভেঙে দেয়ার। নারী সিদ্ধান্ত নিতে পারে বিকল্প পরিবার তৈরি করার। তাতে প্রকৃতি ভারসাম্যহীন হবে। নারীমুক্তি আন্দোলন তাই নারীর একার বিষয় নয়। এটা নারী-পুরুষের যৌথ ইস্যু। নারী এবং পুরুষের মধ্যে জৈবিক কিছু পার্থক্য আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে একজন আরেকজনের চেয়ে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট অথবা সামাজিক কাজের কিছু নারীর অংশ, কিছু পুরুষের অংশ। সব কাজই উভয়ের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। সেই সমাজ ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যেতে হবে, যেখানে পরস্পর পরস্পরের প্রতি সমান সংবেদনশীল থাকবে।

বর্তমানে প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে। নারীমুক্তির সম্ভাবনা বিকাশে প্রযুক্তি শক্ত ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। গার্হস্থ্য কাজের উপকরণ উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভার লাগব করছে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের অগ্রগতি নিজ শরীরের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ সহজ করে দিচ্ছে। বিজ্ঞান জানাচ্ছে— ভ্রূণ থেকে পুরুষ জন্ম নিবে না নারী, তা নির্ভর করে পুরুষের ক্রমোজমের ওপর। সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে নারীর ওপর খড়্গ নেমে আসা অজ্ঞতা মাত্র।

দীর্ঘ মানবেতিহাসে পুরুষরা যে মডেল গড়েছে তা কোনোভাবেই আর্দশ মডেল নয়। জীবনের সূক্ষ্ম সমস্যাগুলি সরলীকৃত করার কোনো অবকাশ নেই। নারীর একার পক্ষে লড়াই করারও কোনো সুযোগ নেই। নারীকে রক্তক্ষরণের দাগ মুছে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে তার ব্যক্তিত্বের মর্যাদা দিবে, না পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার জন্যে কামিনী হয়ে থাকবে। ফতোয়া থেকে পুঁজিবাদ, শিক্ষা থেকে মানবতার দাবি, হাজার বছরের লালিত পুরুষতান্ত্রিক প্রবৃত্তি সব কিছুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই সংগঠন। চাই রাজনৈতিক সচেতনতা। যৌক্তিক এবং বৈজ্ঞানিক সত্য স্বীকার করে নারী-পুরুষকে একই প্লাটফর্মে দাঁড়াতে হবে। তবেই ঘটবে নারীমুক্তি তথা মানবমুক্তি।

হাসনে আরা বেগম প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি, ব্র্যাক। hasneara.b@brac.net